গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৫০ সংখ্যা | ২৬ জুলাই - ১ আগস্ট ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা ■ পৃ. ১

উত্তরপ্রদেশে ১০ জন আদিবাসী হত্যা
দেশজুড়ে বিক্ষোভ এসইউসিআই(সি)-র

শিয়ালদহে বিক্ষোভ সভা। ২০ জুলাই

বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র জেলায় ১৭ জুলাই ১০ জন আদিবাসী মানুষের হত্যার তীব্র নিন্দা করেছেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ১৮ জুলাই এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আদিবাসীদের চাষের জমি দখল করতেই গ্রামপ্রধান সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী নিয়ে এই হামলা চালিয়েছে। তাতে তিনজন মহিলা সহ ১০ জন নিহত হয়েছেন, আহত বহু। আদিবাসীদের উপর এই যে আক্রমণ হতে যাচ্ছে তা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানত। অথচ বিজেপি সরকারের পুলিশ আদিবাসীদের বাঁচাতে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। ফলে, যোগী আদিত্যনাথ সরকার এই মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে না। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সারা দেশেই আদিবাসীদের পরম্পরাগত বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের বিপুল আয়োজন চলছে। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং দেশজুড়ে আদিবাসী উচ্ছেদের প্রতিবাদে ২০ জুলাই সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে তাঁর দাবি নিহতদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

কেন্দ্রের শিক্ষানীতিতে শিক্ষাই বিপন্ন হবে
আন্দোলনের ডাক সেভ এডুকেশন কমিটির

১৯ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে সেভ এডুকেশন কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক কার্তিক সাহা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতির ক্ষতিকারক দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বীকার করা হয়েছে সারা দেশে সরকারি শিক্ষায়তনে স্কুলছুটের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এর অন্যতম প্রধান কারণ যে পাশ-ফেলের অবলুপ্তি সেটা স্বীকার করা হয়নি এবং প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর সুপারিশও করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, মূলধারার শিক্ষা পদ্ধতি অর্থাৎ ক্লাসরুমে শিক্ষকের মাধ্যমে পড়ানোর পরিবর্তে জোর দেওয়া হয়েছে অনলাইন এবং দূরশিক্ষার উপর। অনলাইন বা দূরশিক্ষা শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-শিক্ষক পারস্পরিক ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে শিক্ষার সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এর উপর বেশি জোর দিলে শিক্ষা ব্যাহত হবে। সরকারের এই প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষক নিয়োগ, স্কুল স্থাপনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। তৃতীয়ত, সমস্ত কলেজগুলিকে স্বশাসিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কলেজগুলি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হবে না। তারা নিজেরাই ডিগ্রি দেবে। ডিগ্রিগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের না হওয়ায় কার্যক্ষেত্রে সম

দুয়ের পাতায় দেখুন

১৯ জুলাই কলকাতায় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত কমিটির নেতৃবৃন্দ

আরএসএস-ই কি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাস ঠিক করবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ানো হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব কার? সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের, নির্দিষ্ট করে বললে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলেরই নয় কি? সারা সভ্য দুনিয়ার রীতি এটাই। কোনও দেশে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকলে এর অন্যথা কোনও মতেই হতে পারে না।

কিন্তু দেখা গেল ভারতে বিজেপি জমানা অন্য কথা বলে। এখানে বিজেপি-আরএসএস এবং তাদের অনুগামীরাই শেষ কথা। তাই ১৬ জুলাই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের উপর তাণ্ডব চালাল আরএসএস এবং বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। উপাচার্যের ঘরে সিলেবাস সংক্রান্ত বৈঠকে ঢুকে তারা অধ্যাপকদের মারধোরের হুমকি দিয়ে দাবি জানায়, ইংরেজি সাহিত্যের সিলেবাসে গুজরাট দাঙ্গা সংক্রান্ত ছোট গল্পে যে আরএসএস বিরোধী কথা আছে তা কেটে দিতে হবে। সাহিত্যের সিলেবাসে জাতপাতের বিরুদ্ধে কোনও পাঠ রাখা চলবে না। আরও দাবি আধুনিক ইতিহাসের সিলেবাসে বামপন্থী আন্দোলন সংক্রান্ত অধ্যায় বাদ দিতে হবে। শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত আলোচনায় মার্কস এঙ্গেলস-এর নাম বাদ দিতে হবে। শেষপর্যন্ত উপাচার্য এবং বিজেপি প্রভাবিত কিছু অধ্যাপক অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলকে বলেন, এবিভিপির দাবি অনুসারেই সিলেবাস ঠিক করতে হবে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৭ জুলাই)। এমনিতে উপাচার্যের ঘরে ছাত্রদের ঢোকা প্রায় অসম্ভব করে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বিজেপির ছাত্রসংগঠন বলে কথা, কোনও নিয়ম কি খাটতে পারে! বিজেপি জমানায় দিল্লির মতো জায়গায় উপাচার্য হওয়ার একটাই যোগ্যতা, আরএসএসের বশংবদ হতেই হবে। এভাবেই বিজেপি শিক্ষাকে নিজেদের

দুয়ের পাতায় দেখুন

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন বাড়ানো ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দাবি আদায়

এস ইউ সি আই (সি)-র দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ ১ জুলাই থেকে শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর, শিয়ালদহ-ক্যানিং ও শিয়ালদহ-ডায়মন্ডহারবার শাখায় ৩ জোড়া ট্রেন বাড়িয়েছে।

এটা দলের নেতৃত্বে যাত্রী সাধারণকে নিয়ে লাগাতার আন্দোলনেরই জয়। এই আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির তরফ থেকে যাত্রী সাধারণকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। যাত্রী সুবিধার উন্নতির জন্য দলের কর্মীরা যাত্রীদের নিয়ে ২ জুলাই থেকে কয়েক দিন টানা লক্ষ্মীকান্তপুর, মথুরাপুর, জয়নগর-মজিলপুর, বহড়ু, দক্ষিণ বারাশত, গোচরণ, ক্যানিং, ঘুটিয়ারি শরিফ প্রভৃতি স্টেশনে জনমত সংগঠিত করেন। অতীতের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে আরও ব্যাপক আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে কয়েক হাজার বিশেষ বুলেটিন স্টেশনে স্টেশনে বিক্রি করা হয়।

১৯ জুলাই শিয়ালদহ ডিআরএম অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, (১) সম্প্রতি দলের আন্দোলনের চাপে রেল দপ্তর যে তিন জোড়া ট্রেন বৃদ্ধিকরেছে তা সোনারপুরে শেষ না করে বালিগঞ্জ বা শিয়ালদহ পর্যন্ত চালানো, (২) ক) সকাল ৯টা নাগাদ লক্ষ্মীকান্তপুর-বারুইপুর একটা নতুন ট্রেন, খ) রাত ৮.৩০ শিয়ালদহ-কাকদ্বীপ লোকালকে নামখানা পর্যন্ত চালানো এবং গ) সকাল ৯টা নাগাদ একটি নামখানা-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল চালানো, (৩) প্ল্যাটফর্মগুলোর উচ্চতা বাড়ানো, (৪)

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট

সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ
স্মরণ দিবসে
সমাবেশ

প্রধান বক্তা ঃ **কমরেড প্রভাস ঘোষ,** সভাপতি ঃ কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
স্থান ঃ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, বেলা ৩টা

আর এস এস ঠিক করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস?

একের পাতার পর

পকেটে পোরার চেষ্টা করছে। শিক্ষাকে তাদের 'হিন্দুরাষ্ট্রের' অ্যাজেন্ডার পথে চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিন্তাবিহীন কিছু ভক্ত তৈরির কারখানা বানানোর জন্যই তারা বেছে নিয়েছে ইতিহাস, সাহিত্যের মতো মানববিদ্যার সিলেবাসকে। এর আগে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে এমনই 'ভক্ত'দের পাঠিয়ে তারা বৈদিক রকেট চালিয়েছে, স্টেম সেল থেরাপি মহাভারতের আবিষ্কার ইত্যাদি সব হাস্যকর কল্পনার ঝুড়ি উপুড় করে ভারতকে সারা বিশ্বের কাছে উপহাস্যাস্পদ করে তুলেছে।

ঠিক এই লাইনেই হেঁটে সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে 'রাষ্ট্রসন্ত তুকাদোজি মহারাজ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়' (আরটিএমএনইউ) ইতিহাস অনার্সের সিলেবাসে 'জাতি গঠনে আরএসএসের ভূমিকা' নিয়ে একটি অধ্যায় ঢোকাতে চায়। কোন জাতি? আরএসএস তো ভারতীয় জাতি গঠনের ধারাটাকেই অস্বীকার করে! আমাদের এই দেশে বিশাল এক ভৌগোলিক ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অর্থনৈতিক আদানপ্রদান, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত নৈকট্য ইত্যাদির পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে ভারতীয় জাতি। কিন্তু আরএসএসের আরাধ্য সাভারকর বলেছেন, যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর অধ্যাত্মিক চেতনার কেন্দ্র যেখানে অবস্থিত তারা সেই দেশের জাতির অংশ। অর্থাৎ মুসলিম, খ্রিস্টান, পারসি ইত্যাদি ধর্মের উৎস যেহেতু অন্য কোনও দেশ, তাই এই সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা ভারতীয় নন। অথচ জাতি গঠনের বৈজ্ঞানিক ধারণা বলছে, ধর্ম জাতি গঠনের নির্ণয়ক শক্তি কোথাও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ভারতীয় নবজাগরণের সমস্ত মনীষী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বলেছেন, ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে এই ভারতীয় জাতি গঠনের কাজে অবদান আছে সকলের। এমনকী হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলেছেন, মুসলমানরা বিদেশি এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাহলে আরএসএসের পক্ষ থেকে কোন জাতির কথা বলা হচ্ছে? প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, আরএসএসের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ধারণার পথেই বিশ্ব হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশের হাতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার অস্ত্র তুলে দেয়। এই রাস্তাতেই শক্তি পায় মুসলিম লিগের পাকিস্তান গঠনের দাবি। তিনি বলেছেন, "মুসলিম লিগ সাভারকরের ওই বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হৃদয়ঙ্গম করেছিল।"(স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম) এই নাকি জাতীয়তার ধারণা! জাতীয়তাবাদের নামে আরএসএসের হাত ধরে কোন ভারতকে চিনবে এ দেশের ছাত্ররা? সে ভারত রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের ধর্মীয় হানাহানি মুক্ত, জাতপাতের অভিশাপমুক্ত আধুনিক ভারত নয়, সে ভারত হবে আরএসএস-বিজেপির ধর্মীয় বিদ্বেষের ঘাঁটি!

কেমন জাতীয়তাবাদী আরএসএস? তাদের গুরু গোলওয়ালকর সাহেব তাঁর বই 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড' বইতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলেছেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে তাদের আর এক নেতা বিডি সাভারকর সমস্ত রাজকর্মচারীর কাছে আবেদন করেছিলেন, সরকারের প্রতি অনুগত থাকার। একাধিকবার ব্রিটিশের স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাদের নোটে জানিয়েছে, সংঘ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেয়নি বরং অনুগত থেকেছে। ১৯৩৯ সালে ভিডি সাভারকর গোপনে ভাইসরয়কে জানান যে, "ব্রিটিশ ও হিন্দুদের পরস্পর বন্ধু হওয়া উচিত।"এই যাদের ইতিহাস, তারা আজ মহান জাতীয়তাবাদী বনে যাবে শুধু গায়ের জোরে? আরএসএস এদেশে আধুনিক সংবিধানের বদলে 'মনুস্মৃতি'-র আইন চালু করার দাবি করে। তাদের ভাষায় বর্ণাশ্রম প্রথা অর্থাৎ শূদ্রদের ব্রাহ্মণ-বৈশ্য ইত্যাদিদের পায়ের নিচে রাখার প্রথাটাই বৈজ্ঞানিক। তাদের আদর্শ অনুসারে মেয়েদের যথার্থ স্থান রান্নাঘর, তাদের কর্তব্য হল পুরুষের সেবা আর পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া। এই নীতি মেনে চলতে হবে আজকের ভারতকে? আরএসএস ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকার বদলে তাদের গেরুয়া ঝান্ডাকেই ভারতীয় পতাকা বলে প্রচার করে। সে কথাও তাহলে মেনে নিতে হবে তো? যে সমস্ত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এই অপচেষ্টার প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের বেশ কয়েকজনের প্রাণ গেছে এই স্বঘোষিত হিন্দুত্বের ঠিকাদার বাহিনীর হাতে। তবে আশার কথা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাও থামেনি। বহু বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। যার একেবারে সাম্প্রতিক সংযোজন নাট্যকার এস রঘুনন্দনের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান। তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমিকে চিঠি লিখে বলেছেন দেশে যে যুক্তি-বিজ্ঞান-মুক্তচিন্তা ধ্বংসকারী এবং শ্বাসরোধকারী পরিবেশ চলছে এর মধ্যে পুরস্কৃত হতে তাঁর অন্তরাত্মা সায় না।

প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ১৭ জুলাই বিবৃতিতে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অশোক মিশ্র। ১৯ জুলাইয়ে অপর একটি বিবৃতিতে নাগপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনারও প্রতিবাদ করেছেন তিনি। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এআইডিএসও।

শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় বাড়তি ট্রেনের দাবি আদায়

একের পাতার পর

বিভিন্ন স্টেশনে নতুন অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি বা পুরনো অ্যাপ্রোচ রোডগুলির সংস্কার, (৫) জয়নগর-মজিলপুর সহ বিভিন্ন স্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাউন্টার চালু করা, (৬) চাঁদোখালি স্টেশনের ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নতুন প্ল্যাটফর্মটি চালু করা, (৭) লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনের ২-৩ প্ল্যাটফর্মের বর্ধিত অংশে জল জমা ও মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা দূর করার জন্য একটি ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস চালু করা, (৮) বিভিন্ন স্টেশনে শেড নির্মাণ সহ প্রাক্তন রেলমন্ত্রীর পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো নতুন রেল রুটগুলি চালু করা।

এডিআরএম নতুন ট্রেন চালানো এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে তৎপর হওয়ার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস তরুণকান্তি নস্কর (প্রাক্তন বিধায়ক ও দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য), অজয় সাহা (রাজ্য কমিটির সদস্য), নারায়ণ নস্কর (জেলা কমিটির সদস্য), মঙ্গল মুখার্জি, প্রবীর চক্রবর্তী, আস্মাদ সরকার প্রমুখ।

সেভ এডুকেশন কমিটি

একের পাতার পর

মূল্য পাবে না। চতুর্থত, ভারতীয়ত্বের নাম করে মধ্যযুগীয় বাতিল চিন্তা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, ইংরেজিকে গুরুত্বহীন করে সংস্কৃতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হবে। সমাজে যুক্তিবাদের পরিবর্তে, অন্ধতা-কুসংস্কার বাড়বে। পঞ্চমত, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেসরকারি মালিকদের শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হবে। ফলে শিক্ষায় সরকারি ভূমিকা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। এরকম অজস্র আপত্তিকর বিষয় ৪৮৪ পাতার শিক্ষানীতির পাতায় পাতায় রয়েছে।

সেভ এডুকেশন কমিটি এই শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ২৪ জুলাই জেলায় জেলায় ডি আই অফিসে বিক্ষোভ দেখাবে এবং রাজ্যপালের উদ্দেশে স্মারকলিপি দেবে। ২৮ জুলাই সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সভা হবে গুজরাটে। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবাদী স্মারকপত্র পেশ করা হবে। ২২ আগস্ট হবে কলকাতায় কেন্দ্রীয় কনভেনশন। জুলাই-আগস্ট মাস জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, সেমিনার, কনভেনশন ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতির জনবিরোধী দিকগুলি নিয়ে জনমত গড়ে তোলা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক পবিত্র গুপ্ত, অধ্যাপক মীরাতুন নাহার, অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, অধ্যাপক অলোকেন্দু সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, অধ্যাপক মানস জানা, শিক্ষক তপন সামন্ত, শিক্ষক কার্তিক সাহা প্রমুখ।

গণদাবী পড়ুন ও গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা - ১০৪ টাকা

ডাকযোগে - ১১৭ টাকা

ডায়মন্ড হারবারে গণধর্ষণের প্রতিবাদ

ডায়মন্ড হারবারের রামনগর থানা এলাকার এক গৃহবধূ গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। পরিস্থিতির চাপে ও হতাশায় আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছেন তিনি। ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভানেত্রী কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ২০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে যেভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা দ্রুত বেড়ে চলেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেশের শাসক দলগুলি ক্ষমতা দখলের জন্য হানাহানিতে ব্যস্ত, এদিকে নারীদের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। বাস্তবে অপরাধীরা সাজা না পাওয়ার ফলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলেছে। আমরা এই ঘটনায় মর্মাহত। যারা এই গৃহবধূকে নির্যাতন করেছে এবং তাঁকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিচ্ছে, তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি'।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুতে পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবি

বাঁকুড়া জেলার তালডাংরায় কনারি-গোড়াডিহি গ্রামে রাস্তার উপর ১১ হাজার ভোল্টেজের তার ছিঁড়ে পড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অতি গরিব খেতমজুর গুরুপদ সিং-এর মৃত্যু হয়। ওই ব্যক্তির বৃদ্ধা অন্ধ মা, প্রতিবন্ধী কন্যা ও স্ত্রী বর্তমান। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা গেছে, তাঁরা জঙ্গলে ব্যাঙের ছাতা তুলে, পাতা কুড়িয়ে, লোকের মাঠে-ঘরে কাজ করে কোনওমতে জীবিকা নির্বাহ করেন। অ্যাবেকার তালডাংরা শাখার সম্পাদক গৌতম গরাই, জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, জেলা কমিটির সদস্য গুণময় ব্যানার্জী ওই গ্রামে গিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। পরে তাঁদের নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং অন্ধ মা ও প্রতিবন্ধী মেয়ের ভরণ-পোষণের দাবি জানান।

ভগবানপুর থানা বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

ভগবানপুর থানা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৪ জুলাই বেঁউদিয়া মাতৃপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ৫০ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন রণজিৎ গিরি। বিড়ি শ্রমিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির টাকা না পাওয়ার কথা প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন। এছাড়া প্রসূতি ভাতা, ইন্সিওরেন্স বেনিফিট, গৃহ প্রকল্প বন্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন প্রতিনিধিরা। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড মধুসূদন বেরা। চিত্তরঞ্জন পাইককে সভাপতি ও অজিত কুমার ভুঞাকে সম্পাদক করে ১৩ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির আলোচনা সভা

বহরমপুর রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির কার্যালয়ে ১৪ জুলাই 'নারী নির্যাতন কেন এবং সমাধানের পথ কী' এই বিষয়ে নির্যাতিতা নারীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। হীরা খাতুন, সেলিনা খাতুন, আমিনা বিবি, রাখি খাতুন, সুবেরা বিবি, শ্যামলী সরকার প্রমুখের পর সম্পাদিকা খাদিজা বানু ও পথিকৃৎ পত্রিকার লেখক ও সমাজকর্মী সৌরভ মুখার্জী আলোচনা করেন। শেষে সমিতির পক্ষ থেকে প্রায় একশো জন নির্যাতিতা নারীর মধ্যে নতুন শাড়ি বিতরণ করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপিকা সুজাতা দে বসু, কার্যকরী সমিতির সভাপতি ডাক্তার আলি হাসান, সমিতির সদস্য স্মৃতিরেখা রায়চৌধুরী, আল্পনা রায়চৌধুরী, উৎপল সিনহা চৌধুরী, সমীর বিশ্বাস, আকবর আলি, অমিতা বিশ্বাস, আমিনা খাতুন, রূপা দাস, পরিমল সরকার প্রমুখ।

‘দেশকে ভালবাসছি বলে মালিকের পদলেহন করা কোনও মহৎ কর্ম নয়’

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

৫ই আগস্ট এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৪তম স্মরণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁর রচনার একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

ভারতবর্ষের এই শোষক ও শোষিত দুই ভাগে বিভক্ত সমাজ, বিভক্ত জাতি— এই শ্রেণিবিভক্ত জাতির পটভূমিকায় সমস্ত আন্দোলনগুলোর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে। এখানে একটা কথা আমি যুবকদের বলব যে, ‘দেশপ্রেম’, ‘দেশাত্মবোধ’, ‘দেশের ডাক’, ‘দেশের স্বার্থ’, ‘দেশের ঐক্য’— এইসব কথাগুলোর সাহায্যে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি, বুর্জোয়ারা বেশিরভাগ সময়ই যুবকদের দেশপ্রেমের সুযোগ নিয়ে বিপথে পরিচালিত করে থাকে। এখানে একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, দেশকে ভালবাসা একটা মহৎ কাজ সন্দেহ নেই— কিন্তু দেশকে ভালবাসছি বলে মালিকের পদলেহন করা কোনও মহৎ কর্ম নয়। দেশের স্বার্থের নামে মালিক শ্রেণির স্বার্থকে রক্ষা করে চলা, আর নিজে ভাবতে থাকা যে আমরা দেশকে খুব ভালবাসি, আমরা দেশসেবক— এটা কোনও মহৎ কর্ম নয়। এটা দেশের প্রতি চরম শত্রুতা, না জেনে হলেও চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং শেষ পর্যন্ত দেশের চরম অনিষ্টই এর দ্বারা সাধিত হয়। তাই আমি বলছি, ‘আমাদের দেশ’, ‘আমাদের জাতি’— যার সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা একটা অবিভাজ্য জাতি নয়, তা শ্রেণিবিভক্ত জাতি— যার একদিকে মালিকশ্রেণি, অপর দিকে মজুরশ্রেণি। তাই এখানে ‘জাতীয় ঐক্য’, ‘জনগণের ঐক্য’, ‘যুবকদের ঐক্য’— এই কথাগুলির দু’টি মাত্র সংজ্ঞা হতে পারে, দু’টি অর্থে এই কথাটা বাস্তবিকভাবে ব্যবহার করা চলে, তা হল— হয় মালিকশ্রেণির স্বার্থে যুবকদের, জনগণের, দেশের মানুষের ঐক্য— আর না হয় মজুরশ্রেণির, শোষিতশ্রেণির স্বার্থে দেশের যুবকদের, দেশের জনসাধারণের, শোষিত মানুষের ঐক্য। ‘দেশের ঐক্য’ — এই কথাটার শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মাত্র এই দু’টি সংজ্ঞা হতে পারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে। আর বাকি সব ব্যাখ্যা দেশের নামে লোককে ধাপ্পা দেওয়ার বুর্জোয়া চালাকি মাত্র। তাই শ্রেণিচরিত্রের এবং শ্রেণিস্বার্থের উল্লেখ না করে শুধু ‘দেশের সংহতি’ ও ‘দেশের স্বার্থ’ কথাগুলো বললে চলবে না, ‘দেশের জন্য লড়ছি’— এরকম ভাবে বুঝলেও চলবে না, চলতে পারে না। ‘প্রিসাইজলি’ (যথার্থভাবে) আপনাদের বুঝতে হবে যে, ‘দেশের স্বার্থ’ বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থের অর্থে কোন শ্রেণির স্বার্থের সাথে ঐতিহাসিকভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি শোষিত শ্রেণির স্বার্থের সাথে, শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের সাথে, কৃষক-খেতমজুরদের স্বার্থের সাথে, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের সাথে দেশের স্বার্থের প্রশ্নটি মিলিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এদেরই স্বার্থে দেশের আন্দোলন, যুবশক্তিকে পরিচালিত করা, যুবসমাজকে সুসংগঠিত করাই হবে দেশের কাজ করা। তাই ‘দেশের স্বার্থ’ কথাটার সাথে যুবকদের এই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, এই বিচার থাকা দরকার যে, তাঁরা ভারতবর্ষের এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে দেশের স্বার্থ বলতে যে স্বার্থের ঝান্ডা নিয়ে চলতে চাইছেন সেটা শোষক শ্রেণির স্বার্থ, না শোষিত শ্রেণির স্বার্থ। এই বিচারটি সমাধা না করে ভাসাভাসাভাবে ‘দেশ’ ‘দেশ’ করলে আমরা বার বার মালিক শ্রেণির চক্রান্তে পা দেব, তাদের হাতে শিকার হব, ইচ্ছা না থাকলেও হয়তো তাদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করে বসে থাকব। এমন ঘটনা আগেও বহু বার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ঘটবে।

আমি এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে বিস্তারিতভাবে যেতে চাইছি না। কিন্তু, আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত জিনিসটা যুব সম্প্রদায়ের কাছে রাখতে চাইছি এইজন্য যে, শুধু পশ্চিমবাংলা বলে নয়, ভারতবর্ষ বলে নয়, গোটা পৃথিবীর সমস্ত আন্দোলনেই যুবসমাজ— শুধু মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুবকদের কথা নয়— শ্রমিক-চাষি যুবক, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল যুবক-যুবতীদের সম্মিলিত শক্তিই এই আন্দোলনের আসল প্রাণশক্তি। বুড়োরা, হিসেবিরা, সনাতনপন্থীরা কোনও দিন সমাজে তুফান তুলতে পারেনি, সমাজের পরিবর্তন আনতে পারেনি, সামাজিক সমস্যা শেষপর্যন্ত সমাধান করার জন্য আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি, বা আন্দোলন পরিচালনা করেনি। যারা সমাজকে পাল্টেছে, যারা সভ্যতাকে গড়ার জন্য বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে, তারা সব দেশেই যুব সম্প্রদায়। আর, এই যুব সম্প্রদায় শুধু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় নয়, শোষিত শ্রেণির যুবসমাজ।

— যুব সমাজের প্রতি, ১৯৬৭। রচনাবলি, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০

আখচাষিদের পাওনা ২০ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে না চিনিকল মালিকরা

দেশের অন্যতম বাণিজ্যিক ফসল আখ। উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে আখচাষিরা আজ বিপন্ন। এই বিপন্নতা প্রাকৃতিক কারণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য নয়। এই বিপন্নতা সৃষ্টি হয়েছে চিনিকল মালিকদের অন্যায় আচরণের কারণে। সঙ্গে দোসর উত্তরপ্রদেশ সরকার। ১৮ জুন পর্যন্ত হিসাবে চিনিকলগুলির কাছে প্রায় ১৮,৯৫৮ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে আখচাষিদের। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে এর মধ্যে প্রায় ১১,০৮২ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। কেন বকেয়া? মালিকরা চাষিদের থেকে আখ নিয়ে দাম দেয়নি। পরে দেবে— এই আশ্বাসেই চাষিরা লরিবোঝাই আখ মিলমালিকদের দিয়ে এসেছে। কিন্তু মালিকরা টাকা না দিয়ে চাষিদের বারবার ঘোরাচ্ছে।

আখ এমন ফসল যে চাষিদের তা ঘরে রাখার উপায় নেই। তাছাড়া হাজার হাজার টাকা ঋণ করে চাষিরা চাষ করেন। ঋণ শোধ করতে দ্রুত বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু বাজারে সরকারি উদ্যোগে কেনার কোনও ব্যবস্থা নেই। ক্রেতা একমাত্র চিনিকল মালিকরাই। ফলে তারা যে দাম বলবে সেই দামেই চাষিকে বিক্রি করতে হবে। যতটুকু নগদে দেবে তাই মানতে হবে। আর যা বাকি থাকবে তা যে কবে উদ্ধার হবে কেউ জানে না। বিজেপি উত্তরপ্রদেশের শাসন ক্ষমতায়। এই চিনিকল মালিকরা নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ টাকা বিজেপিকে দিয়ে থাকে। বিজেপি সরকার তাদের স্বার্থেই এই বঞ্চনা প্রতারণার বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেয় না। শুধু বিজেপি কেন, মালিকদের স্বার্থরক্ষাকারী কোনও দলই এ কাজ করেনি। ফলে কংগ্রেস থেকে সমাজবাদী দল, সমাজবাদী দল থেকে বহুজন সমাজ পার্টি বা বিজেপি— একই ধারায় শোষণ চলেছে।

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কত দেবেন, বিজেপি কত দেবে সেই প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছুটেছে। কিন্তু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির এই ছক থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা যদি প্রতিশ্রুতি দিতেন চাষির ফসলের ন্যায্য দাম পাইয়ে দেওয়ার, যদি ব্যবস্থা করতেন মালিক-ফড়ে-পাইকারদের শোষণ বন্ধ করার— তাহলে চাষির খানিকটা উপকার হত। যদি তাঁরা সার- বীজ- কীটনাশক সহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভরতুকি দিতেন, তাহলে কৃষির উৎপাদন ব্যয় কমত। চাষির কিছু সুরাহা হত। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় কাজগুলি না করে কংগ্রেস-বিজেপি সহ সব পুঁজিবাদী সরকার চাষিদের চরম বিপন্নতায় ঠেলে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই চাষিদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ রয়েছে। তেমনি মালিকরাও কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। কিন্তু ধর্ম-বর্ণ অনুসারে মালিকরা কাউকে রেয়াত করেনি। বিজেপির হিন্দুত্ববাদী সরকারও হিন্দু চাষিদের সমস্যায় নড়ে বসেনি।

মালিকের ধর্ম হল শোষণ। এর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম সহ সমাজের সকল অংশের শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে। উত্তরপ্রদেশের আখচাষিদের যে হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে মালিকদের কাছে, তা উদ্ধার করতে হলে সকল অংশের চাষির ঐক্যবদ্ধ লড়াই চাই। মালিকরা এই ঐক্য ভাঙার কাজেও নানাভাবে মদত দেয়। কখনও কখনও সাম্প্রদায়িকতাকেও ব্যবহার করে। এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে শ্রমিক-চাষির মৈত্রী দৃঢ় করতে হবে। আওয়াজ তুলতে হবে ‘অবিলম্বে যোগী সরকারকে কৃষকদের বকেয়া আদায়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতারক মালিকদের গ্রেপ্তার করতে হবে।’

মানুষ খেতে না-পাক আম্বানিদের মুনাফা বেড়েই চলেছে

বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে অর্ধেক হয়ে গেলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তার উপর নানা নামের কর চাপিয়ে যখন রান্নার গ্যাস, ডিজেল-পেট্রলের বাড়তি দামের বোঝা জনগণের ঘাড়ে ক্রমাগত চাপিয়ে যাচ্ছে তখন শুধু পরিশোধনাগার ও তেল বিপণন থেকে কর্পোরেট পুঁজির মালিক মুকেশ আম্বানির আয় হয়েছে ১,০১,৭২১ কোটি টাকা। তাঁরই আর একটি সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চলতি অর্থ বছরে নিট মুনাফা হয়েছে ১০,১০৪ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে মুনাফা কোম্পানির আশার থেকে অনেক বেশি। কোম্পানির টেলিকম ও খুচরো ব্যবসায় জুন ত্রৈমাসিকে মোট আয় ২১.২৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১.৬১ লক্ষ কোটি টাকা। সরকারি টেলিকম সংস্থা বিএসএনএল যখন সরকারি অবহেলা, মন্ত্রী-আমলাদের চক্রান্তে মুখ থুবড়ে পড়েছে তখন রিলায়েন্স জিও-র মুনাফা ৪৫.৬০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৮৯১ কোটি টাকা। অন্য দিকে, খুচরো ব্যবসায় বিক্রি বেড়েছে ৪৭.৫ শতাংশ। খুচরো ব্যবসা থেকে তাদের আয় ৩৮,১৯৬ কোটি টাকা। ১৯ জুলাই ট্রাই যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে কলকাতায় গ্রাহকসংখ্যার বিচারে বর্তমানে এক নম্বরে উঠে এসেছে রিলায়েন্স জিও।

বিশ্ব অর্থনীতির অঙ্গ হিসাবে ভারতের অর্থনীতিও যখন মন্দার আক্রমণে বিপর্যস্ত, যখন এই অজুহাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে, বেকার যুবকদের কোথাও কাজ জুটছে না, কৃষকরা হাজারে হাজারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে, সাধারণ মানুষ ক্রমাগত দারিদ্রের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে তখন এ দেশের সবচেয়ে ধনী পুঁজিপতি মুকেশ আম্বানির কিন্তু লক্ষ কোটি টাকার মুনাফা করতে কোনও অসুবিধা হল না। এই হল পুঁজিবাদী ভারতে ‘সব কা সাথ সব কা বিকাশে’র ছবি!

সূত্র ঃ এই সময়, ২০ জুলাই ২০১৯

উত্তরপ্রদেশে আদিবাসী হত্যার প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ

উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র জেলায় ১০ আদিবাসীকে হত্যার প্রতিবাদ। ২২ জুলাই, দিল্লি

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল চিত্তরঞ্জনের রেলশ্রমিকরা

চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানাকে রেলদপ্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বেসরকারিকরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। রেল মন্ত্রকের "হান্ড্রেড ডেজ অ্যাকশন প্ল্যান" নাম দিয়ে ১৮ জুন রেল বোর্ড একটি কালা সার্কুলার জারি করে। এই সার্কুলারের উদ্দেশ্য চিত্তরঞ্জন সহ রেলের সাতটি প্রোডাকশন ইউনিটকে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দিয়ে বেসরকারিকরণের দিকে একধাপ এগিয়ে দেওয়া। এই সার্কুলারের প্রতিবাদে রেলের প্রোডাকশন ইউনিটগুলিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। চিত্তরঞ্জনের সবকটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং অ্যাসোসিয়েশন এক যোগে 'সেভ সিএলডব্লু জয়েন্ট অ্যাকশান কমিটি' গঠন করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ৫ জুলাই জি এম অফিসের সামনে প্রায় দশ হাজার মানুষের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয় (ছবি), এবং সিএলডব্লু প্রশাসনের মাধ্যমে রেল বোর্ডকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় । ১৪ জুলাই চিত্তরঞ্জন শহরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড অর্ধেন্দু মুখার্জী বলেন, আমরা সবকটি ট্রেড ইউনিয়ন মিলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি নিয়েছি।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বিকাশ ভবন অভিযান

বর্তমান শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন, মেয়াদ বৃদ্ধির চালাকি বন্ধ করে ষষ্ঠ পে-কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও দ্রুত কার্যকর, ডাইস রিপোর্টে উল্লেখিত প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনক্রম চালু, ইন্টার্ন শিক্ষক নয় প্রতি বছর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ, এস এস কে-গুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমর্যাদা প্রদান ইত্যাদি ১২ দফা দাবিতে ৯ জুলাই বিপিটিএ-র উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষকরা বিকাশভবন অভিযান করেন।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা এবং অন্যান্য শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অজিত হোড়। সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর, পে-কমিশন এবং সিলেবাস কমিটিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

আসামে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বদলীয় কমিটি গঠনের দাবি রাজ্য কমিটির

আসামে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকায় প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ইতিমধ্যে শিশুসহ ৫০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ৫০ লক্ষাধিক মানুষ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।প্রতিদিন নতুন নতুন অঞ্চল জলমগ্ন হচ্ছে। নদী ভাঙন এক বিভীষিকার পর্যায়ে পৌঁছেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। পানীয় জলের অভাবে মানুষ প্রচণ্ড দুর্ভোগে। রাজধানী গুয়াহাটির বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধসে কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে। পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (সি) আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস ১৭ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, এই বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা, বানভাসি মানুষদের উদ্ধার ও আশ্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে যুদ্ধকালীন তৎপরতা প্রয়োজন ছিল তা দেখা যায়নি। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিলকেও ঠিকমতো ব্যবহার করে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

নির্বাচনের সময় বিজেপি আসামের বন্যা এবং নদীভাঙনের সমস্যা সমাধানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা যে একেবারেই ফাঁপা সে কথা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কমরেড চন্দ্রলেখা দাস দাবি করেন, বন্যাকবলিত মানুষকে দ্রুত উদ্ধার ও তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্যসামগ্রী, পানীয় জল, শিশু খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তিনি দাবি জানান, বন্যাকবলিত এলাকায় ব্লিচিং পাউডার এবং জীবানুনাশক ছড়িয়ে মহামারী রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। গবাদি পশুগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান তিনি। ত্রাণের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তা তদারকির জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার জন্য তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান।

মথুরায় শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণ

উত্তর প্রদেশের মথুরায় এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০ জুলাই। সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর কালানের এন এস কে ইস্টার কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ লোকেশ পালিভাল। সংগঠনের সর্ব ভারতীয় কমিটির কাউন্সিল সদস্য কমরেড দীনেশ মহন্ত প্রধান বক্তা ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ভোলু সিংহ, বীরেন্দ্র সিংহ, রাম নারায়ণ শর্মা, কমরেড যোগেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ প্রমুখ।

'একজন নাট্যকার ও কবি হিসাবে এই পুরস্কার গ্রহণ করতে পারি না'

কর্ণাটকের বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক এস রঘুনন্দন সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন। দেশে ধর্মের নামে একের পর এক গণপ্রহার এবং বিরোধী স্বরকে দমন করার আবহের বিরুদ্ধে 'হতাশা' জানিয়েই তাঁর এই পদক্ষেপ। গত কালই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল । এর আগেও মোদি জমানায় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সরব হয়ে বহু বিশিষ্ট জন তাঁদের সরকারি পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

রঘুনন্দন এ দিন বলেন, "এটা আমার প্রতিবাদ নয়। আমার সিদ্ধান্ত তীব্র হতাশা আর অসহায়তা থেকে। অ্যাকাডেমির প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। পুরস্কারপ্রাপকদের প্রতিও শ্রদ্ধা আছে। আমি সকলকে ধন্যবাদ দিয়েই নিজের অপারগতা জানাচ্ছি।"

অ্যাকাডেমির উদ্দেশে চিঠিতে রঘুনন্দন লিখেছেন, "সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি স্বশাসিত সংস্থা। সামগ্রিক ভাবে স্বশাসনের নীতিতেই চালিত হয়েছে বরাবর। আমাকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করায় আমি অ্যাকাডেমিকে ধন্যবাদ জানাছি। ... কিন্তু দেশ জুড়ে ধর্মের নামে এমনকি খাদ্য নিয়েও আজ হানাহানি, গণপ্রহার সংঘটিত হচ্ছে। শাসকেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাতে মদত দিচ্ছেন। ... শিক্ষাক্রমের মধ্যে বিদ্বেষ আর অযুক্তির বীজ বুনে দেওয়া হচ্ছে । ভারতীয় কথাটার মানে বদলে যাচ্ছে। বসুধৈব কুটুম্বকমের ধারণা মুছে যাচ্ছে, ...অগণিত বুদ্ধিজীবী এবং সমাজকর্মীকে ইউএপিএ-তে আটক করা হচ্ছে। ...আমার দেশের নাম করে যখন আমাদের দেশের প্রকৃত ধর্মমার্গীদের প্রতি এই সব অন্যায় হয়ে চলেছে, তখন আমি একজন নাট্যকার ও কবি হিসাবে এই পুরস্কার গ্রহণ করতে পারি না। আমার অন্তর্যামী আমাকে সেই অনুমতি দেয় না।"

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুলাই, ২০১৯

হাওড়ায় শিশু-কিশোর উৎসব

কমসোমলের উদ্যোগে ১৪ জুলাই হাওড়া শহরে অনুষ্ঠিত হল শিশু-কিশোর উৎসব। শহরের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৭০ জন শিশু কিশোর, হাওড়া ময়দান সংলগ্ন মরিয়াস ডে স্কুলে চলা উৎসবে নানা বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। শরীর চর্চা, যেমন খুশি আঁকো, গান-আবৃত্তি-ছড়াবলা, পরে স্লাইডের সাহায্যে সৌরজগৎ জানা ও ম্যাজিক বনাম বিজ্ঞানে সকলে খুব প্রাণবন্তভাবে অংশগ্রহণ করে। কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী শিশু কিশোরদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে বড় মানুষদের জীবন চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের
কান্দি মহকুমা কনভেনশন

কান্দি মহকুমা হাসপাতাল সহ অন্যান্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিবেশ রক্ষা, ডাক্তার-নার্স ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফ রোগী অনুপাতে নিয়োগ, সমস্ত জীবনদায়ী ওষুধ এবং কুকুর ও সাপে কামড়ানো ভ্যাকসিন সরবরাহ, সমস্ত ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা, দালাল চক্র বন্ধ করা, সর্বোপরি ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে সুষ্ঠু চিকিৎসার দাবিতে ১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরে 'নীড় অনুষ্ঠান ভবনে' পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের উদ্যোগে কান্দি মহকুমা জনস্বাস্থ্য কনভেনশন আয়োজিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ও প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ রবিউল আলম।

৯ জনের উপদেষ্টা কমিটি এবং রামকৃষ্ণ মণ্ডলকে সভাপতি, অরিন্দম পালকে কার্যকরী সভাপতি, আমিরুল সেখ ও সামিয়ুল আখতারকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৫৮ জনের কান্দি মহকুমা কমিটি গঠিত হয়।

বাঁকুড়ায় মিড ডে মিল কর্মীদের সভা

সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, ন্যায্য বেতন, পেনশন চালু, প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে বাঁকুড়া ১ ও ২নং ব্লকের তিন শতাধিক মিড ডে মিল কর্মী ১৩ জুলাই মাচানতলা সভাগৃহে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী সংগঠনের সভাপতি অশোক দাস এবং বাঁকুড়া জেলা ইনচার্জ সুজিত রায়।

পূর্ব মেদিনীপুরে ছাত্র সম্মেলন

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ রোধ, ছাত্রস্বার্থ বিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ বাতিল, ছাত্রী নিগ্রহ বন্ধ, মদ নিষিদ্ধকরণ, পরিবহণে ছাত্র কনসেশন সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামোযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবিতে ১৪ জুলাই তমলুকের সুবর্ণজয়ন্তী ভবনে অনুষ্ঠিত হল এ আই ডি এস ও-র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নবম ছাত্র সম্মেলন। জেলার ২৫০টি স্কুল ও সমস্ত কলেজ থেকে প্রায় আট শতাধিক ছাত্রছাত্রীর একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে সুবর্ণজয়ন্তী হলে পৌঁছায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনুরূপা দাস। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা সংহারকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ, রাজ্য সভাপতি ডাঃ কমরেড মৃদুল সরকার, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড সামসুল আলম এবং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অনুপ মাইতি। কমরেড স্বপন জানাকে সভাপতি, কমরেড দীপঙ্কর মাইতিকে সহ সভাপতি ও কমরেড বিশ্বজিৎ রায়কে সম্পাদক করে ২৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলী, ৩২ জনের জেলা কমিটি ও ৮৭ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা
প্রশ্ন তুললেন দেড়শো বিশিষ্ট নাগরিক

স্বশাসিত সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও শাসক দলের হয়ে কাজ করার অভিযোগ আগেও উঠেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। কিন্তু এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই সংস্থার যে চরম নির্লজ্জ দলদাসত্বের পরিচয় পাওয়া গেল, তা সত্যিই ব্যতিক্রমী। নির্বাচন চলাকালীনই শাসক বিজেপির হয়ে কমিশনের অত্যন্ত নগ্ন পক্ষপাতিত্বের গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করে সংবাদমাধ্যমে, জনমনেও।

ব্যতিক্রমী কেন? কারণ, দেশের ৭২ বছরের ইতিহাসে এমন খোলাখুলি পক্ষপাতিত্ব ইতিপূর্বে ঘটেনি— এমন ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুলেছেন দেশেরই অবসরপ্রাপ্ত আমলা, শিক্ষাবিদ সহ ১৪৫ জন বিশিষ্ট মানুষ। খোদ কমিশনের কাছে খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন তাঁরা। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন জহর সরকার, অভিজিৎ সেনগুপ্ত, ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ, হর্ষ মান্দার, অরুণা রায়, অ্যাডমিরাল বিষ্ণু ভাগবত, প্রবাল দাশগুপ্ত, লীলা শাসমলের মতো অবসরপ্রাপ্ত আইএএস, সেনাবাহিনীর প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি, খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষকরা।

চিঠির মূল বিষয়বস্তু, ২০১৯ সালের নির্বাচন স্বাধীন দেশের ৭২ বছরের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা কম মুক্ত ও নিরপেক্ষ (ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার) হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পদ্ধতিগত প্রশ্নে নিয়মভঙ্গ করেছে কমিশন। আদর্শ আচরণবিধি প্রকাশিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়নি, অথবা বেমালুম চেপে গিয়েছে। নিয়ম ভাঙা বা আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি কমিশন। গোচরে আনা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। শাসক বিজেপির স্বার্থে নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণ থেকে শুরু করে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের আদর্শ নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ, সাম্প্রদায়িক প্ররোচনামূলক বক্তব্য প্রচার, সেনাবাহিনীর নামে ভোট চাওয়া, জাত-পাত নিয়ে বিদ্বেষমূলক প্রচার, নমো টিভি থেকে নির্বাচনী বন্ড, সর্বোপরি ই ভি এম বিতর্ক— সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি যাতে নানা সরকারি প্রকল্প ঘোষণার সময় হাতে পান, সেই কারণেই কি এ বছর মার্চ মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষার পর নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হল?

চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেছেন, তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যে যেখানে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা কম ছিল সেখানে এক দফায় ভোট হয়েছে। আবার অপেক্ষাকৃত কম আসন বিশিষ্ট রাজ্য যেখানেই তাদের জেতার সম্ভাবনা বেশি মনে করেছে, সেখানেই বেশ কয়েক দফায় ভোট করা হয়েছে। এ ছাড়াও সংখ্যালঘুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, নির্বাচনী প্রচারে উস্কানিমূলক মন্তব্য করা ও আদর্শ নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অভিযোগ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা সত্ত্বেও কমিশনের পক্ষপাতিত্বমূলক বদান্যতায় তাঁদের ছাড় দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

লোকসভা নির্বাচনে কর্ণাটক, রাজস্থানের মতো রাজ্যে বিপুল জয়লাভের পরে পরেই ওই সব রাজ্যেরই পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির শোচনীয় পরাজয় প্রমাণ করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি সত্য ছিল। বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ চিঠির শেষে কমিশনের এই পক্ষপাতমূলক আচরণ ও কার্যকলাপের জবাব চেয়েছেন খোদ কমিশনের কাছেই।

দেশের সমস্ত নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষ ও মুক্তভাবে পরিচালিত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রে সাংবিধানিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হল নির্বাচন কমিশন। অথচ তার বিরুদ্ধেই উঠেছে নির্বাচনে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের গুরুতর অভিযোগ। আসলে পুঁজিবাদী সংসদীয় ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। তথাকথিত গণতন্ত্র, নিরপেক্ষতা আজ সোনার পাথরবাটি। এই ব্যবস্থায় নির্বাচন আজ আর জনমতের যথার্থ প্রতিফলন নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, যে কোনও ভাবে পুঁজিপতিদের সেবাদাস দলগুলিকে জিতিয়ে আনা। নামে যতই 'স্বশাসিত' হোক, এই পচা-গলা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে থেকে কোনও সংস্থারই নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করা দিনে দিনে যে কঠিন হয়ে পড়ছে তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের এই লজ্জাজনক আচরণ তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বারাসতে পৌরস্বাস্থ্যকর্মী কনভেনশন

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের নানা দাবি নিয়ে ১৪ জুলাই বারাসত বিদ্যাসাগর সভাকক্ষে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার পৌরসভাগুলির স্বাস্থ্যকর্মীদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বারাসাত, বসিরহাট, হাবড়া, বনগাঁ, হালিশহর, ভাটপাড়া, অশোকনগর, গোবরডাঙা, ব্যারাকপুর, নিউব্যারাকপুর, বিধাননগর প্রভৃতি পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু, যুগ্ম সম্পাদক পৌলমী করঞ্জাই ও রাজ্য কমিটির সদস্য কবিতা সাহা, ঈশ্বর সরকার ও শিবানী মুখার্জী। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন তীব্রতর করতে কনভেনশন থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ হয় এবং একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

পাঠকের মতামত

রাজনীতি ও আদর্শ

সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হল। আমরা এ দেশের কোটি কোটি নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষ গত ৫ বছরে মোদিজির শাসন থেকে কী পেয়েছি আর আগামী ৫ বছরে কী পেতে পারি এক বার ভেবে দেখা কি উচিত নয়? এডিআর (অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস)-এর হিসাব অনুযায়ী ভারতে ২০১৪ সালে সাংসদদের ৪৪৩ জন ছিলেন কোটিপতি, আর ২০১৯ সালে নব নির্বাচিত ৫৪২ জনের মধ্যে ৪৭৫ জন কোটিপতি। এবারের নির্বাচিতদের মধ্যে ২৩৩ জন সাংসদ মানুষ খুন, খুনের চেষ্টা, নারী পাচার, নারী ধর্ষণ, কিডন্যাপ এবং অস্ত্র ব্যবসায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত (গণদাবী ৭১ বর্ষ-৪৬ সংখ্যা)।

ভারতবর্ষে ১৩০ কোটি মানুষের ৯০ শতাংশেরও বেশি দরিদ্র-নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের, বড়জোর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আর ১০ শতাংশেরও কম মানুষ কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক। বিশ্বের তথাকথিত বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় দেশ পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ, আইন-কানুন প্রভৃতি ঠিক হয় সংসদে। সেখানে বিপুল সংখ্যক কোটিপতি-শিল্পপতি-কর্পোরেট মালিক কাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা সহজেই অনুমেয়। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ চাষি ফসলের দাম না পেয়ে ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করছে, ঘরে ঘরে বেকার যুবক-যুবতীরা হাহাকার করছে, নারী পাচার, শিশু পাচার, নারী নির্যাতন দেশ জুড়ে অবাধে চলছে। শিক্ষা-চিকিৎসা নিয়ে অবাধে ব্যবসা করছে কর্পোরেট মালিকরা। অনাহারে, অপুষ্টিতে বিনা চিকিৎসায় রাজ্যে রাজ্যে শিশুমৃত্যুর অবিরাম স্রোত বইছে, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রায় নিশ্চিহ্ন, জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণকে উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে মানুষকে বিভক্ত করা হচ্ছে সর্বগ্রাসী পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মেই দেশের কোটি কোটি নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের উপরে চলছে শোষণ-জুলুম-অত্যাচার আর মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে জমা হচ্ছে কোটি কোটি কালো টাকার পাহাড়। কোটিপতি সাংসদরা এই পুঁজিপতি শ্রেণিরই প্রতিনিধি। তাঁরা মুখে যতই বলুন 'আচ্ছে দিন' আসবে, 'সব কা বিকাশ সব কা সাথ' হবে, দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল হবে, — তা বাস্তবে আদৌ কী সম্ভব? স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিছুদিন পর্যন্ত যাঁরা রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের চরিত্রে ন্যূনতম কিছু গুণ ছিল। সততা, নিষ্ঠার অভাবও পুরোপুরি হয়নি। যদিও তার কিছু দিন পর থেকেই কংগ্রেস এমনকি সিপিএম নেতারাও দুর্বৃত্তদের আশ্রয় দিয়ে তাদের কাজে লাগাতেন বিভিন্ন সময়ে— কখনও ভোটের ময়দানে, কখনও বিরোধী রাজনৈতিক দলকে কোণঠাসা করতে, এমনকি গণআন্দোলন দমন করতেও। বর্তমান যুগে এই দুর্বৃত্তরাই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলের নেতা। এরাই আবার এমএলএ, এমপি হিসাবে নির্বাচিত হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে রাজ্যে রাজ্যে বা কেন্দ্রে অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্যই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং শত শত কোটি টাকার মালিক, কর্পোরেট পুঁজির প্রতিনিধি। ফলে, পুঁজির স্বার্থ চরিতার্থ করাটাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আপামর জনসাধারণের প্রতি এঁদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিলিয়ে আর কালো টাকার বিনিময়ে অসৎ উপায়ে ভোটে জেতার কৌশল আবিষ্কার করা।

জনগণের স্বার্থবাহী আদর্শভিত্তিক রাজনীতিকে শক্তিশালী করা ছাড়া এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ নেই।

জয়দেব সরকার,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর

কাশীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথা কাটাকাটির বিবরণ লিখে গিয়েছেন তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন— "আমি বিশ্বেশ্বর মানি না... বিদ্যাসাগরের এই উক্তি তাঁহার নাস্তিকতার প্রমাণ দেয়। বিদ্যাসাগর আপন মত স্বাধীনভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আবার তিনি অপরকে স্বাধীন ও সঙ্গত মত প্রকাশে অকুণ্ঠিত দেখিলে প্রীতিলাভ করিতেন।" এই প্রসঙ্গে বিহারীলাল একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, একদিন ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় রাখালাদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও পঞ্চানন তর্করত্ন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় ধর্মের তর্ক উঠল। বিদ্যাসাগর বললেন, "দেখ, ধর্ম-কর্ম ওসব দল বাঁধা কাণ্ড, এই দেখ, মনুর একটি শ্লোক— যে নাম্য পিতরো যাত য মেন মাতাঃপিতমাহাঃ/তেনযায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছানন দুষ্যতি (মনুসংহিতা)। অর্থাৎ পিতা-পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন, সৎপথ অবলম্বন করিয়া সেই পথেই চলিবে, তাহাতে চলিলে দোষ হয় না। কেন বাপু, সৎ পথেই যদি চলিবে তবে আবার পিতা-পিতামহ কেন? দুই পথ না বলিলে দল রক্ষা হয় না, এই না? পাছে অপর জাতির সৎপথে লোক যায়, দল ভাঙিয়া যায়, এই জন্যই না মনু ঠাকুরকে এত মাথা ঘামাইতে হইয়াছে! তাই বলি ধর্ম-কর্ম ওসব দল বাঁধা কাণ্ড।"

এই হলেন বিদ্যাসাগর, এক আধুনিক বস্তুবাদী ও মানবতাবাদী চরিত্র, পুরনো দিনের বস্তাপচা ধারণা ভেঙে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। এই বিদ্যাসাগরের অমূল্য ব্যক্তিত্ব ক'জন মানুষ বুঝেছেন! না হলে নবজাগরণের পীঠস্থান এই বাংলায় আজ তাঁর মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়!

দুশো বছর পেরিয়ে গেলেও যাঁরা তাঁর চিন্তাকে নিজেদের জীবনে পাথেয় করেছেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের ছবি বুকে নিয়ে হাঁটছেন। আর তাঁর মূর্তি ভাঙতে যাদের হাত কাঁপে না, সেই ধর্ম-ব্যবসায়ীরা আসলে ভয় পায় তাঁর উন্নত চিন্তা ও আধুনিকমনস্কতাকে।

গোপাল সিং
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের অনুরোধে ঃ গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'দাভোলকরদের হত্যার পিছনে হিন্দুত্ববাদীরাই, কবুল খোদ হত্যাকারীর' প্রতিবেদনটির সংবাদসূত্র জানতে চেয়েছেন এক পাঠক। সূত্রগুলি হল, আনন্দবাজার পত্রিকা-২৭ জুন, '১৯, দ্য ওয়্যার.ইন-২৮ জুন '১৯, ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ.এনডিটিভি.কম।

শিক্ষায় বেসরকারিকরণের রাস্তা সুগম করবে কেন্দ্রীয় বাজেট

দ্বিতীয় দফার নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রথম বাজেটই দেখিয়ে দিল এই সরকার শিক্ষাকে কোন দৃষ্টিতে দেখে। বাস্তবে 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতিই প্রতিফলিত হল বাজেটে।

এ বছর বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৯৪ হাজার ৮৫৪ কোটি টাকা। শিক্ষা খাতে এবার বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে বলে সমানে ঢাক পিটিয়ে চলেছে সংঘ পরিবার ও প্রচারমাধ্যমের একাংশ। অথচ বাস্তবে গত বছরের ২.৯ শতাংশ থেকে কমে এবার শিক্ষা খাতে খরচ দাঁড়িয়েছে মোট অভ্যন্তরীণ আয় বা জিডিপি-র ২.৮ শতাংশ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার ঠিক আগে ২০১৩-'১৪ সালের বাজেটে এটা ছিল জিডিপি-র ৪.৭ শতাংশ।

খুঁটিয়ে দেখলে বেরিয়ে আসছে আরও ভয়ানক তথ্য। দেখা যাচ্ছে, এ বছর শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকার জোগান আসবে বাজেট বরাদ্দ থেকে। বাকি ৪৪ হাজার ৬০ কোটি টাকা আসবে 'মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা কোষ' এবং 'প্রারম্ভিক শিক্ষা কোষ' থেকে, যা শিক্ষা সেস হিসাবে সমস্ত কেন্দ্রীয় করের সাথে জনগণের ঘাড় ভেঙে আদায় করা হচ্ছে। ফলে, বাজেটে শিক্ষা খাতে এবার আদৌ বরাদ্দ বাড়েনি, বরং বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে, এ কথা পরিষ্কার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-এর ২০১৭-'১৮-র বার্ষিক রিপোর্টে দেখা গেছে, শিক্ষা সেস হিসাবে আদায় করা টাকার মধ্যে ৯৬ হাজার ১৩ কোটি টাকা ব্যবহারই করা হয়নি! কেন্দ্রীয় সরকার এ টাকা খরচ করে উঠতে পারেনি! শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা বটে! সরকার শিক্ষাখাতে সত্যি সত্যি কত ব্যয় করছে? এ প্রশ্ন উঠছে, কারণ— 'হায়ার এডুকেশন ফিনান্সিং এজেন্সি' বা এইচইএফএ-র মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নয়ন খাতে যে অর্থ পেয়েছে, তাদের তা শোধ করে দিতে হবে। সে টাকা শোধ হবে ছাত্রদের ঘাড় ভেঙে বাড়তি ফি আদায় করেই তো? অথচ 'দেশদ্রোহী' উপাধি না পেতে হলে মানতেই হবে নরেন্দ্র মোদির মতো শিক্ষাদরদি বিশ্বে আর হয় না! দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী মানুষ দাবি করে আসছেন, কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ না করলে দেশে শিক্ষার যথাযথ প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্ত সরকারই বরাদ্দের পরিমাণ কমানোর সাথে সাথে শিক্ষায় সরকারি ভরতুকির পরিমাণও ক্রমে কমিয়ে দিচ্ছে।

এবারে বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি-র জন্য ব্যয় গত বছরের বরাদ্দ ৪ হাজার ৬০১ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৪ হাজার ৭২৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। একইভাবে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন-এর বরাদ্দ ৪৮৫ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৪৫৮ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী একদিকে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর স্লোগানে চারদিক ভরিয়ে তুলছেন, অন্যদিকে বাজেটে 'ন্যাশনাল স্কিম ফর ইনসেনটিভ টু গার্ল চাইল্ড ফর সেকেন্ডারি এডুকেশন' অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষায় যেতে মেয়েদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্তরের পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গত বছর এই খাতে বরাদ্দ ছিল ২৫৬ কোটি টাকা, এবার তা নেমে এসেছে মাত্র ১০০ কোটি টাকায়।

বর্তমানে দেশে ১০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষক পদ শূন্য। অথচ এবারের বাজেটে সরকার শিক্ষক শিক্ষণ ও বয়স্ক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ২০১৮-'১৯ সালের ৮৭১ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে দাঁড় করিয়েছে মাত্র ১২৫ কোটি টাকায়। স্কুল-পড়ুয়াদের অপুষ্টি নিয়ে অবিরত চোখের জল ঝরাতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহচরদের। অথচ এ বছরে বাজেটে স্কুলছাত্রদের পুষ্টিকর খাদ্য জোগানোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা! মিড ডে মিলে ছাত্র পিছু বরাদ্দ বেড়েছে ১৩ পয়সা আর ২০ পয়সা। এই বাজেটে কোনও মেডিকেল কলেজ, আইআইটি, আইআইএম এবং গবেষণা সংস্থার মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন করে তৈরির সরকারি পরিকল্পনার কথা বলা হয়নি। শুধু তাই নয়, যে সংস্থাগুলি রয়েছে সেগুলির দুর্দশাগ্রস্ত পরিকাঠামোর উন্নতির জন্যও কোনও অর্থ পর্যন্ত বরাদ্দ করা হয়নি।

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, শিক্ষা খাতে এই সামান্য বাজেট বরাদ্দের একটা বড় অংশ আবার ব্যয় করা হবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য। বাজেটে 'ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন' স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই সংস্থা অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। বোঝা কঠিন নয়, এর মাধ্যমে একদিকে গবেষণার অজুহাতে জনগণের অর্থ নিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলি ব্যবসা করবে, অন্যদিকে টাকার অভাবের কথা বলে সরকারি সংস্থাগুলিতে গবেষণার কাজে ব্যাঘাত ঘটানো হবে।

এবারের বাজেটে শিক্ষার সর্বাত্মক বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে 'হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া' (এইচইসিআই) নামে একটি স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা নির্মাণের বিষয়ে জোর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এ ব্যাপারে মতামতও আহ্বান করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রস্তাবিত খসড়ার আকারে থাকা অবস্থাতেই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯-এর সুপারিশগুলি রূপায়ণের যে ঘোষণা সরকার করেছে, তা থেকেই শিক্ষার প্রতি তাদের অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিস্টসুলভ মানসিকতার পরিচয় মেলে। ফলে এইচইসিআই বিষয়ে মতামত আহ্বান করার বিষয়টিও যে শুধু মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এই শিক্ষাবিরোধী এবং ছাত্রস্বার্থবিরোধী বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করেছে সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে গত ৭ জুলাই। শিক্ষা প্রসারের নামে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের পায়ে ঢেলে দেওয়ার বিজেপি সরকারের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে দেশের ছাত্রসমাজ সহ সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

(৩)

চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে নিয়ে টাকা ধার করে তিনি একটি ছাপাখানা খোলেন। প্রেস থেকে তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই হিন্দি বৈতাল পচ্চিশির অনুবাদ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’। মার্শাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য তিনশো টাকায় একশোটি ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ কিনে নিলেন। এ ছাড়া ছাপাখানা থেকে ১০০টি ‘অন্নদামঙ্গল’ বই ছেপে দেওয়ার জন্য ৬০০ টাকা আগাম দিয়ে দিলেন। ওই টাকায় ধার শোধ করেন তিনি। ছাপাখানার কাজ, বই লেখা, সাথে সাথে সামাজিক কু-প্রথার হাত থেকে অসহায় নারীদের মুক্ত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

১৮৪৯ সালের ১ মার্চ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হলে ওই পদে যোগ দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করলেন মার্শাল সাহেব। মার্শাল সাহেবের অনুরোধে আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরি নিলেন তিনি।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শ্রেণির অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫০ সালে তিনি জজ-পণ্ডিত হয়ে মুর্শিদাবাদে চলে গেলে ওই পদ শূন্য হয়। কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যোগ্য বিবেচনা করে ওই পদে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে আবার আসতে রাজি ছিলেন না। তবু ময়েট সাহেবের অনুরোধ এড়াতে না পেরে বললেন, তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগ দিতে রাজি আছেন। ময়েট সাহেব কথা দিলেন। ঠিক হল, সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর একটি রিপোর্ট দাখিল করবেন এবং সেটি তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন। ১৬ ডিসেম্বর তিনি রিপোর্ট দাখিল করেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত বুঝলেন কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরকেই কলেজের দায়িত্ব দেবে। তাই ডিসেম্বরেই তিনি ইস্তফাপত্র দিয়ে দিলেন।

১৮৫১ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে বিদ্যাসাগরকে অস্থায়ী সেক্রেটারি করা হল। ২২ জানুয়ারি তাঁকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল করা হল। ১৫০ টাকা মাইনে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নানা পরিকল্পনা ও পরিবর্তনে কলেজের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেল। সন্তুষ্ট হলেন কর্তৃপক্ষ। নিজের পরিকল্পনা মতো শিক্ষানীতি প্রণয়নে অনেক স্বাধীনতা পেলেন। ১৮৫৪ সালে বিদ্যাসাগরের মাইনে বেড়ে ৩০০ টাকা হল।

ওই বছরই বাংলার ছোটলাট হয়ে এলেন হ্যালিডে সাহেব। তিনি এ দেশে বাংলা বিদ্যালয় গড়ে তোলার পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্য চাইলেন। তাঁর ইচ্ছায় বিদ্যালয়গুলির সহকারি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ সালের মে মাস থেকে এ কাজের জন্য তাঁকে ২০০ টাকা মাইনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। বিদ্যালয় গড়ে তোলার সাথে সাথে শিক্ষাপ্রসারের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় হাত দিলেন তিনি।

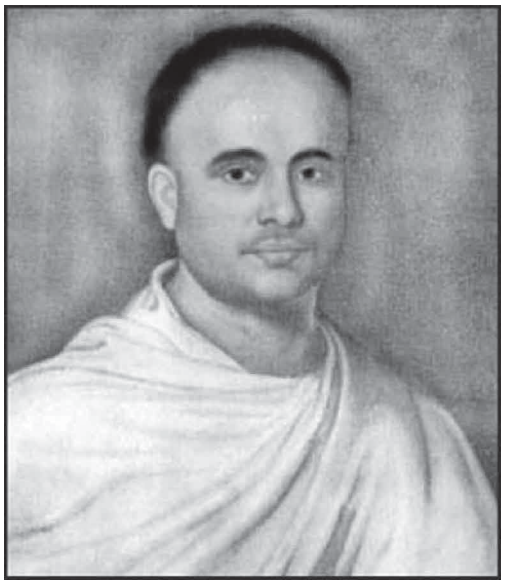

সে সময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল বাল্যবিবাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা ও কৌলীন্য প্রথা। এই প্রথায় মেয়েরা যে দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করত তা দেখে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। তিনি কু-প্রথার হাত থেকে অসহায় মেয়েদের রক্ষা করার জন্য এগুলি পরিবর্তন করার চেষ্টা শুরু করলেন।

ইতিমধ্যেই শুরু করেছিলেন সামাজিক কু-প্রথা দূর করার কাজ। ১৮৫০ সালে ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্য গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করেন। এ নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তিনি। বাল্য বিধবাদের দুঃখ দেখে বিধবাবিবাহ আইন চালুর চেষ্টা করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে আইন চালু করার জন্য একটি আবেদনপত্র লিখে নিজে বিশিষ্টজনদের কাছে ঘুরে ঘুরে এবং সমর্থকদের দিয়ে ৯৮৬ জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। তাঁর পরিচিতদের অনেকে হিন্দুধর্মের সমর্থকদের বিরোধিতার ভয়ে বিধবা বিবাহকে সমর্থন করলেও আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে চাননি, তিনি তাঁদের বুঝিয়ে স্বমতে আনার চেষ্টা করেছেন, সাহস দিয়েছেন। তৎকালীন সমাজপতিরা চতুর্দিক থেকে বাধা ও আঘাতে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। মারাত্মক আক্রমণ, অপবাদ, নিন্দা, এমনকী শারীরিক আক্রমণের মধ্যেও তিনি ছিলেন অটল।

তিনি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যিক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নহি। ... আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব।”

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, ‘বিদ্যাসাগরের হৃদয় ছিল একদিকে কুসুমের মতো কোমল, অন্যদিকে বজ্রের মতো কঠোর।’ অসহায় নারীর দুঃখে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ত, আবার এদের রক্ষার জন্য কু-প্রথা দূর করার আন্দোলনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। কোনও বাধা বিপত্তিই তাঁকে থামাতে পারত না। তাই বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে বিধবাবিবাহ চালুর দাবিতে স্বাক্ষর করা আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠালেন ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে।

১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই ‘বিধবা বিবাহ আইন’ পাশ হয়ে গেল। এরপর অনেক বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই উদ্যোগ আয়োজন করে বিধবাবিবাহ দেওয়ার অনুষ্ঠান করেন। যা ঠিক বলে মনে করতেন তিনি সে কাজ সমস্ত বাধা, আঘাত ও অপমান সহ্য করে শেষপর্যন্ত করতেন। কাউকে ভয়ে মাথা নত করতে বা অন্য রকম করতে দেখলে তিনি অত্যন্ত রেগে যেতেন।

এ প্রসঙ্গে বহু ঘটনার মধ্যে একটির উল্লেখ করা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুস্থানীয়। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে প্রথমদিকে তিনি সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতে রাজি হননি। রমাপ্রসাদ রায় বলেছিলেন—‘আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম।’ এ কথা শোনার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারেননি। তারপর দেওয়ালে টাঙানো রামমোহন রায়ের ছবির দিকে লক্ষ করে বলেন, ‘ওটা দেওয়ালে রেখেছ কেন? ওটা ফেলে দাও, নামিয়ে রাখ’— এ কথা বলেই হন হন করে বেরিয়ে যান। এ রকমই তাঁর বন্ধুস্থানীয় কেউ কেউ তাঁর পাশে দাঁড়াননি, তবু তিনি পিছিয়ে যাননি।

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর

১৮৫১ সাল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের গেটে চিন্তিত মুখে পায়চারি করেছেন তিনি। কলেজ শুরুর ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। অথচ অনেক শিক্ষক তখনও কলেজে আসেননি। প্রতিদিন এরকমই দেরি করে আসেন অনেকেই। সেদিন দেরি করে কলেজে ঢোকার সময় তাঁরা দেখলেন বিদ্যাসাগর গেটে পায়চারি করছেন। কাছাকাছি আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—‘এই এলেন বুঝি’?

ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসা। এর বেশি কিছু বলতে পারেননি তিনি। অধিকাংশ শিক্ষক ছিলেন তাঁর গুরুমশায়। এই ছোট্ট জিজ্ঞাসার মধ্যে তাঁরা কিন্তু বুঝে নিলেন আর দেরি করে আসা চলবে না। ঠিক সময়ে সবাইকে আসতে হবে।

কেউ কেউ একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন— এমন ঘুরিয়ে বলার কী দরকার! বিদ্যাসাগর তো সরাসরি বলতে পারতেন।

যাই বলুক না কেন ওই ছোট্ট জিজ্ঞাসার জন্যই সকলে ঠিক সময়ে আসা শুরু করলেন। অধ্যক্ষ হয়ে প্রথমেই সংস্কৃত কলেজে শৃঙ্খলা আনতে চাইলেন। ছাত্রদের ঠিক সময়ে আসার নির্দেশ দিলেন, অধ্যাপকদেরও কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন কলেজে ঠিক সময়ে আসার গুরুত্ব। শৃঙ্খলা আনার সাথে সাথে পাঠ্যসূচির পরিবর্তনের কথাও বললেন। আগে সংস্কৃত কলেজ মূলত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হত না। এমনকি বাংলা ভাষা শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর ছিল না। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক ভাল করে না পড়ানোর ফলে সংস্কৃত কলেজের পাশ করা ছাত্রদের বিষয়বস্তুর উপলব্ধি, যথার্থ জ্ঞান যেমন অসম্পূর্ণ থাকত তেমনই চাকরি পাওয়ার অসুবিধা হত। যে সব ছাত্র ইংরেজি শিখতে চাইত তারা এখানে পড়তে আসত না। এ জন্য সংস্কৃত কলেজে পড়ার উৎসাহ না থাকায় এখানে ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করলেন।

সংস্কৃত কলেজে তিনি ইংরেজিকে অবশ্যপাঠ্য করলেন। আগে গণিত শেখানো হত সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে। বিদ্যাসাগর বললেন—‘যে সংস্কৃত বই দুটির মাধ্যমে অঙ্ক শেখানো হয় তাতে সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের শিখতে অনেক বেশি সময় লাগে। সংস্কৃতের বদলে ইংরেজির মাধ্যমে গণিত বিদ্যার শিক্ষা দিলে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে অনেক বেশি শিখতে পারবে। তাই ইংরেজির মাধ্যমে গণিত শিক্ষা চালু করলেন। সংস্কৃতের কঠিন পাঠগুলিকে অনেকটা সরল করলেন।

পূর্বে সংস্কৃত কলেজে কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পড়ার অধিকার ছিল। তিনি এই নিয়ম পরিবর্তন করে অন্যদেরও পড়ার সুযোগ করে দিলেন। অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথি ধরে সংস্কৃত কলেজে ছুটি দেওয়া হত। বিদ্যাসাগর ইউরোপীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতি রবিবার ছুটির নিয়ম চালু করলেন।

এই সব পরিবর্তনের ফলে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেল। সেই সময়কার কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ সাহেব তাঁর এইসব শিক্ষাপ্রসারের পরিপূরক পরিবর্তনের বিরোধিতা করলে তিনি কর্তৃপক্ষকে লিখলেন—‘আমার আবেদন হল, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে দিন প্রধানত বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য। তার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার সুযোগ দিন।’ তাঁর মতে ‘বাংলাদেশের শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।’ ‘... সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।’ (চলবে)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি’ প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মদ ও মাদক দ্রব্য বিরোধী আন্দোলন জেলায় জেলায়

দক্ষিণ দিনাজপুর

মদের দোকানের নতুন লাইসেন্স না দেওয়া, পুরনো লাইসেন্স বাতিল সহ নানা দাবিতে ঝাড়গ্রামের রাধানগর গ্রামের প্রায় ২০০ জন মহিলা ১৫ জুলাই জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান।

১৪ জুলাই বালুরঘাটে মন্মথ মঞ্চে দুই শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় মদ ও মাদক দ্রব্য বিরোধী নাগরিক কনভেনশন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষিকা শিউলি দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রুনা পুরকায়েত। কনভেনশনে প্রণবেশ চৌধুরীকে সভাপতি, বাবলি বসাককে সম্পাদক এবং সাগর সরকারকে কোষাধ্যক্ষ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মদ ও মাদক বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

ঝাড়গ্রাম

একই দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন-২ জাগরণ মঞ্চ। মঞ্চের পক্ষ থেকে শতাধিক মহিলা সহ এলাকার মানুষ মিছিল করে ১৮ জুলাই দাঁতন-২ বিডিও এবং জোড়াগেড়িয়া ফাঁড়ির ওসির কাছে ডেপুটেশন দেন। মঞ্চের দাবি, এলাকায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং অবৈধ মদের দোকান বাড়ছে। এর ফলে স্কুলের ছাত্ররা পর্যন্ত মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। বিডিও দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দীপঙ্কর দাস, সুভাষ দাস প্রমুখ। জাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের ফলে দাঁতন-২ ব্লকে বৃহৎ একটি কোম্পানির গড়ে তোলা মদের কারখানা বন্ধ হয়ে যায় কয়েক বছর আগে।

পশ্চিম মেদিনীপুর

জয়নগরে রাস্তার দাবিতে অবরোধ, দাবি আদায়

জয়নগর থেকে জামতলা এবং পদুয়ার মোড় থেকে ঢাকী পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। খানা খন্দে ভরা, মানুষ এবং যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য রাস্তায় দুর্ঘটনা প্রায় লেগেই থাকে। বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে বারবার ডেপুটেশন দেওয়া সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বাধ্য হয়ে ১৬ জুলাই এলাকার মানুষজন এস ইউ সি আই (সি) জয়নগর ২নং ব্লক কমিটির ডাকে প্রিয়র মোড় অবরোধ করে। তিন ঘন্টা অবরোধ চলার পর পিডব্লিউডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, বকুলতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা অবরোধস্থলে এসে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ওখানেই তিন দিনের মধ্যে কাজ শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। এরপর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বিক্ষোভ স্থলে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সালামত মোল্লা, নিরঞ্জন নস্কর, পুষ্প পাল, কুমকুম সরকার, আমির আলি ঘরামি, আনসার সেখ, সুভাষ জানা প্রমুখ।

নারায়ণগড়ে কৃষকদের বিডিও ডেপুটেশন

ধানের কুইন্টাল প্রতি ২,০০০ টাকা সহায়ক মূল্য, ফসলের লাভজনক দাম এবং কৃষিঋণ মকুব সহ ১৩ দফা দাবিতে ১৮ জুলাই নারায়ণগড় বিডিওকে ডেপুটেশন দিল এস ইউ সি আই (সি) এবং অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠন। বেলদা ট্রাফিক স্ট্যান্ডের সামনে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়।

সহায়ক মূল্যে ধান কেনার ব্যবস্থা, এনরেগা প্রকল্পে বকেয়া টাকা মেটানো, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি বন্ধ, কেলেঘাই নদীর উপর গনুয়া ব্রিজ তৈরি, কেশিয়াড়ি মোড়ে যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও শৌচাগার নির্মাণ, বেলদা কালীমন্দিরের সামনে জমা আবর্জনা পরিষ্কার করার দাবি তোলা হয় পথসভায়। বেলদাকে মহকুমা ঘোষণার দাবিও তোলা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। বৃষ্টি না হওয়ার পরিস্থিতিতে খরা অঞ্চল ঘোষণা করা এবং সেচের ব্যবস্থা করে দেরিতে হলেও চাষের বন্দোবস্ত করার আবেদন জানানো হয়। সমস্ত দাবি বিবেচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বিডিও।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সূর্য প্রধান, তুষার জানা, জেলা কমিটির সদস্য স্বদেশ পড়িয়া, শ্যামাপদ জানা, ধীরেন ওঝা প্রমুখ।

ভর্তির দাবিতে ডি এস ও-র স্মারকলিপি ত্রিপুরায়

ত্রিপুরায় প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী এ বছর কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। অবিলম্বে তাদের ভর্তির ব্যবস্থা করা, কলেজে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, স্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগ সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিতে ৮ জুলাই এ আই ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড মৃদুল সরকার জানান, দ্রুত ওই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কর্ণাটকে মেডিকেল কলেজে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ

কর্ণাটকের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ম্যানেজমেন্ট কোটা ছাড়া সরকারি সিটগুলিতে ব্যাপক ফি বৃদ্ধি হয়। এর প্রতিবাদে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ২২ জুন বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বর্ধমান শহরে রেলের নতুন উড়ালপুল সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুনর্বাসনের দাবিতে ১৭ জুলাই পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন। নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা হকার ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com